بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ৩১ ফাতাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(সূরা আত্ তাওবা: ৪০)

সওর গুহায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর (আশ্রয় গ্রহণ করার) ঘটনা সম্পর্কে গত খোতবায় আলোচনা হচ্ছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে অর্থাৎ সওর গুহায় শত্রুদের পৌঁছে যাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন তার অনুবাদ হল: 'যদি তোমরা এই রসূলকে সাহায্য না-ও কর তবুও (স্মরণ রেখ!) আল্লাহ্ সেই সময়ও তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, এমতাবস্থায় যে, সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; এবং সে তার সঙ্গীকে বলছিল, দুঃখ কর না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতএব আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন যাদেরকে তোমরা কখনও দেখ নি। আর যারা অবিশ্বাস করেছিল তিনি তাদের কথাকে হেয় প্রতিপন্ন করে দেখালেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কথাই প্রাধান্য রাখে। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়'।

পবিত্র কুরআনে সওর গুহার ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আলোচনা রয়েছে।

মক্কার কাফিররা গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল আর তা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) একথা ভেবে বিচলিত হন যে, যদি মহানবী (সা.)-কে এখানে ধরে ফেলা হয় তাহলে কী হবে? কেননা গোটা ইসলামের অস্তিত্বই তো এই আশিসপূর্ণ সত্তার কারণেই বিদ্যমান বা টিকে আছে। মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই বিচলিত অবস্থা যখন তিনি (সা.) দেখেন আর্থাৎ তিনি (সা.) যখন দেখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বিচলিত হয়ে পড়ছেন (তখন) মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا হে আবু বকর! দুঃখিত হয়ো না, নিশ্চয় আমাদের খোদা আমাদের সাথে আছেন। মহানবী (সা.)-এর পশ্চাদ্ধাবন করে তারা যখন সওর পাহাড়ের গুহার কাছে পৌঁছে তখন খোঁজী বা অনুসন্ধানী বলে, আমি বুঝতে পারছি না যে, এরপর তারা দু'জন কোথায় নিজেদের পা রেখেছেন? এরপর তারা যখন গুহার নিকটবর্তী হল, তখন অনুসন্ধানী বলল, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যার সন্ধানে এসেছ তিনি এখান থেকে আর সম্মুখে অগ্রসর হন নি। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে সেই অনুসন্ধানী যখন এসব কথা বলছিল তখন কেউ একজন গুহার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতেও চায়, তখন উমাইয়্যা বিন খাল্ফ কঠোর অথচ ভ্রুক্ষেপহীন কণ্ঠে বলে, এই (মাকড়াশার) জাল এবং এই গাছ তো আমি মুহাম্মদের জন্মের পূর্বে থেকেই এখানে দেখে আসছি। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?

সে এখানে কীভাবে থাকতে পারে! তাই এখান থেকে চলো; অন্য কোথাও গিয়ে তাকে খুঁজি। আর একথা বলে তারা সেখান থেকে ফেরত চলে আসে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে মক্কার কুরাইশদের ঘোষণা এবং মহানবী (সা.)-এর পশ্চাদ্ধাবন করা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো,

'তারা সর্বসাধারণ্যে ঘোষণা করে দেয় যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে যে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনবে তাকে পুরস্কার হিসেবে একশ' উট প্রদান করা হবে। পুরস্কারের লোভে অনেকেই মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ে। মক্কার কুরাইশ নেতারাও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তাঁর (সা.) পিছু নেয় এবং ঠিক সওর গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে গিয়ে খোঁজী বলে, সামনে আর পায়ের ছাপ নেই। তাই মুহাম্মদ হয় আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে অথবা আকাশে চলে গেছে। কেউ বলল, কোন ব্যক্তি এই গুহার ভিতরে গিয়ে দেখে আসো। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি বলে, এ কি কোন বিবেক সম্মত কথা! কেউ কি এ গুহায় গিয়ে লুকোতে পারে! এ তো এক অত্যন্ত অন্ধকার ভয়াবহ স্থান আর আমরা এটিকে সর্বদা এমন-ই দেখে এসেছি। এ বর্ণনাও দেখা যায় যে, গুহার মুখে যে গাছ ছিল, মহানবী (সা.) ভিতরে প্রবেশ করার পর সেটিতে মাকড়শা জাল বুনেছিল আর গুহার ঠিক মুখে গাছের ডালে কবুতর বাসা বানিয়ে ডিম পেড়ে রেখেছিল।

হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.)-এর মতে এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল কিন্তু সত্যিই যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে আদৌ অবাক হওয়ার কিছু নেই কেননা মাকড়শা অনেক সময় কয়েক মিনিটে এক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে জাল বুনতে সক্ষম, কবুতরের বাসা তৈরি করতে এবং ডিম দিতেও বিলম্ব হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'লা যদি নিজ রসূলের সুরক্ষাকল্পে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই বরং সেই মুহূর্তে এমনটি হওয়া যৌক্তিক মনে হয়। যাহোক, কুরাইশের কোন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয় নি, আর সেখান থেকেই সব লোক ফেরত চলে যায়। তিনি (রা.) আরও লেখেন, রেওয়াতে উল্লেখ আছে, কুরাইশরা এতটাই নিকটে গিয়ে পৌঁছে যে, গুহার ভিতর থেকে তাদের পা দেখা যাচ্ছিল এবং তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) শঙ্কিত চিত্তে ক্ষীণকণ্ঠে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরাইশ এতটাই নিকটে যে, তাদের পা দেখা যাচ্ছে। তারা যদি একটু অগ্রসর হয়ে উঁকি দেয় তাহলে আমাদেরকে দেখতে পাবে। মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ভয় পেও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। وما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما অর্থাৎ হে আবু বকর! এই দু'ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের সাথে তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা? অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরাইশ যখন গুহার কাছে গিয়ে উপণীত হয়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) ভীষণ শঙ্কিত হন। মহানবী (সা.) তার (রা.) শঙ্কিত অবস্থা দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শঙ্কার কোন কারণ নেই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) ধরা কণ্ঠে বলেন, **'ইন কুতিলতু ফা আনা রাজুলুন ওয়াহিদুন, ওয়া ইন কুতিলতা, আনতা হালাকাতিল উম্মাহ্** অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যদি নিহত হই তাহলে আমি তো কেবল একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু আল্লাহ্ না করুন, আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে পুরো উম্মতই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। তখন তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এলহাম পেয়ে বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا অর্থাৎ হে আবু বকর! তুমি শঙ্কিত হয়ো না কেননা আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন আর আমরা উভয়ে তাঁর সুরক্ষা চাদরে

আবৃত। অর্থাৎ তুমি আমার কারণে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছ, আর তুমি নিষ্ঠার আতিসহ্যে নিজের প্রাণের বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন। তবে আল্লাহ্ তা'লা এখন কেবল আমাকে সুরক্ষা করবেন না বরং তোমাকেও সুরক্ষা করবেন আর তিনি আমাদের উভয়কে শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) যখন হিজরতের অনুমতি পেলেন, তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে সওর পাহাড়ে গেলেন যা মক্কা থেকে প্রায় ৬/৭ মাইল দূরে অবস্থিত আর সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। প্রভাতে যখন কাফিররা দেখে যে, তিনি (সা.) নিজ বাড়িতে নেই আর সবধরণের পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) সফলভাবে বেরিয়ে গেছেন, তাই তাৎক্ষণিকভাবে তারা তাঁর (সা.) খোঁজে বেরিয়ে পড়ে আর মক্কার কয়েকজন দক্ষ খোঁজী- যারা পদচিহ্ন দেখার বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিল, তাদেরকে সাথে নেয় এবং তারা খুঁজতে খুঁজতে (কুরাইশদেরকে) সওর গুহার কাছে নিয়ে আসে এবং বলে মহানবী (সা.) যদি থেকে থাকেন তাহলে এই গুহাতেই আছেন। এরপর আর কোন পদচিহ্ন নেই। অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ছিল যে, শত্রু ঠিক গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল আর গুহার মুখ এতটা সংকীর্ণও ছিল না যে, ভিতরে দেখা কঠিন হবে বরং এটি খোলা মুখবিশিষ্ট প্রসস্ত একটি গুহা ছিল। ভেতরে কেউ বসে আছে কিনা তা খুব সহজেই উঁকি মেরে দেখা সম্ভব ছিল কিন্তু এমন অবস্থায়ও মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে কোনো ভয়-ভীতি ছিল না বরং তাঁর (সা.) পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে হয়রত আবু বকর (রা.)-এর হৃদয়ও শঙ্কামুক্ত থাকে এবং তিনি (রা.) মুসা (আ.)-এর সঙ্গীদের ন্যায় একথা বলেন নি যে, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম বরং তিনি (রা.) যদি কোনো কথা বলে থাকেন তা হলো, 'হে আল্লাহর রসূল (সা.)! শত্রুরা এতটাই নিকটে পৌঁছে গেছে যে, তারা যদি সামান্য নিচে উঁকি দেয় তাহলে আমাদের দেখতে পাবে।' কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, **'উসকুত ইয়া আবা বাকরিন, ইসনানিল্লাহু সালেসুহুমা'** হে আবু বকর (রা.) চুপ থাকো, আমরা এই মুহূর্তে কেবল দুজন নই, আমাদের সাথে তৃতীয় সত্তা খোদা তা'লা রয়েছেন, তাই তাদের জন্য আমাদেরকে দেখা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? অতএব এমনই হয়। শত্রুরা গুহার মুখে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও সামনে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার সুযোগ পায় নি আর বিড়বিড় করে অভিশাপ দিতে দিতে তারা সেখান থেকে চলে যায়। বস্তুত এ ঘটনার একটি দিক হচ্ছে, হযরত মুসা (আ.)-এর সাথীরা ভীতত্রস্ত হয়ে একথা বলেছিল যে, হে মুসা (আ.) আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মোটকথা তারা নিজেদের সাথে মুসা (আ.)-কে জড়িয়ে নেয় আর ধারণা করে যে, আমরা সবাই ফেরাউনের হাতে ধরা পড়তে যাচ্ছি। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর খোদার প্রতি ভরসা তাঁর (সা.) সাথীর ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তার (রা.) মুখ থেকে একথা বের হয় নি যে, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। তিনি (রা.) শুধুমাত্র একথা বলেছিলেন যে, শত্রুরা আমাদের এতটাই নিকটে চলে এসেছে যে, তারা চাইলে আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু মহানবী (সা.) এ ধারণাকেও পছন্দ করেন নি। তিনি (সা.) বলেন, এমন আশঙ্কা করো না কেননা, এখন আমরা দু'জন নই বরং আমাদের মাঝে তৃতীয় সত্তা হিসাবে আমাদের খোদা আছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অন্য এক জায়গায় বলেন, যখন মক্কার লোকেরা রসূল (সা.)-এর ওপর সীমাতিরিক্ত অত্যাচার শুরু করে, যার ফলে ধর্মীয় কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল,

তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মক্কা ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর (সা.) এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) মক্কা ছেড়ে যাওয়া জন্য প্রস্তুতি নেন। এর পূর্বে আবু বকর (রা.)-কে হিজরত করে যাওয়ার জন্য কয়েকবার বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিজরতের জন্য যাত্রার সময় মুহাম্মদ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কেও নিজের সাথে নিয়ে নেন। রাতের বেলা তারা যাত্রা করেন আর এক জায়গায় গিয়ে তাঁরা আশ্রয় নেন, যেটি ছিল সামান্য একটি গুহা মাত্র। সেটির মুখ ২/৩ গজ চওড়া হবে। হয়রত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হজ্জের সময় আমিও সেই জায়গাটি দেখেছি। মক্কার লোকেরা যখন জানতে পারল যে, তিনি (সা.) চলে গেছেন তখন তারা তাঁর (সা.) পশ্চাধাবন করল। আরবে অনেক অভিজ্ঞ খোঁজী ছিল যাদের সাহায্যে পশ্চাধাবনকারীরা ঠিক সেখানে পৌঁছে যায় যেখানে রসূল (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) আশ্রয় নিয়েছিলেন। খোদার কুদরতে গুহার মুখে কিছু চারা গাছ উদ্গত হয়েছিল, যেগুলোর ডালপালা পরস্পর একাকার হয়ে ছিল। যদি তারা এই ডালপালাকে সরিয়ে ভিতরে দেখত তাহলে তারা রসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-কে বসা অবস্থায় দেখতে পেত। খোঁজী যখন গুহার মুখে পৌঁছায় তখন সে বলে, হয় মুহাম্মদ আকাশে চলে গেছে না হয় গুহার ভেতরে লুকিয়ে আছে, এছাড়া আর কোথাও যায় নি। চিন্তা করে দেখ! সেটি কেমন স্পর্শকাতর মুহূর্ত ছিল! তখন হযরত আবু বরক (রা.) বিচলিত হয়েছিলেন কিন্তু নিজের জন্য নয় বরং রসূল করীম (সা.)-এর জন্য। তখন মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ভীত হচ্ছেন কেন? খোদা তা'লা আমাদের সাথে আছেন। নবী করীম (সা.) যদি নিজ সত্তায় খোদা তা'লাকে না দেখতেন তাহলে এমন সংকটময় সময়ে ভয় পাবেন তা কী করে সম্ভব। অত্যন্ত শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী মানুষও শত্রু হঠাৎ করে সামনে এসে গেলে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু রসূল করীম (সা.)-এর একেবারে নিকটে বরং বলা উচিত মাথার ওপর শত্রু দাঁড়িয়েছিল আর শত্রুও তারা যারা বিগত ১৩ বছর যাবৎ প্রাণনাশের চেষ্টা করে আসছিল এবং যাদেরকে খোঁজি বলছিল, হয় তিনি আকাশে উঠে গেছেন নয়তো এখানেই বসে আছেন, এখান থেকে আগে যান নি; এমন সময় রসূল করীম (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا অর্থাৎ খোদা তা'লা আমাদের সাথে আছেন, আপনি ভীত হচ্ছেন কেন? এটি খোদা তা'লার ইরফান বা খোদা–সংক্রান্ত জ্ঞানই ছিল যার জন্য মহানবী (সা.) একথা বলেছেন। তিনি (সা.) নিজের মাঝে খোদা তা'লাকে প্রত্যক্ষ করতেন এবং উপলব্ধি করতেন যে, আমার ধ্বংসের মাধ্যমে খোদা তা'লার ইরফান বা তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ ঘটবে, তাই কেউ আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর সঙ্গ দেয়ার জন্য কেবল এক ব্যক্তিকেই সাথে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ টমাসকে। যেভাবে আমাদের নবী (সা.) মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করার সময় কেবল আবু বকর (রা.)কে সাথে নিয়েছিলেন। কেননা রোমান সাম্রাজ্য হযরত ঈসা (আ.)কে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল। এই অপরাধেই পিলাতকেও রোমান সম্রাটের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল, কেননা নেপথ্যে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহায্যকারী ছিলেন এবং তার স্ত্রীও হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী ছিল। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য কোন দলবল সাথে না নিয়ে সংগোপনে এই দেশ ত্যাগ করা আবশ্যক ছিল। এজন্য এই সফরে তিনি কেবল টমাস নামক হাওয়ারীকে সাথে নেন যেভাবে আমাদের নবী (সা.) তাঁর মদিনার সফরে কেবল হযরত আবু বকর (রা.)কে সাথে নিয়েছিলেন। আর

আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর বাকি সাহাবীরা যেভাবে বিভিন্ন পথ ধরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হন অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পথ ধরে ঈসা (আ.)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছে।

অপর একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিষ্ঠা সেই বিপদের যুগে প্রকাশিত হয় যখন মহানবী (সা.)কে অবরুদ্ধ করা হয়। কোন কোন কাফের দেশান্তরের মতামত দিলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মহানবী (সা.)কে হত্যা করার পক্ষে ছিল। এমন (সংকটময়) যুগে হযরত আবু বকর (রা.) তার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা সর্বকালের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই সংকটময় মুহূর্তের জন্য মহানবী (সা.)-এর এই মনোনয়নই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সততা ও সুমহান বিশ্বস্ততার অকাট্য প্রমাণ। মহানবী (সা.)-এর মনোনয়নের স্বরূপও এমনই ছিল। তখন তাঁর কাছে সত্তর-আশি জন সাহাবী ছিলেন। যাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন কিন্তু তাদের সবার মধ্যে থেকে তিনি (সা.) তাঁর সঙ্গ দেয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)কে মনোনীত করেন। এর রহস্য কী? মূলকথা হলো– নবী আল্লাহ্ তা'লার চোখে দেখেন এবং তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধির ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লাই দিব্যদর্শন ও এলহামের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, হযরত আবু বরক (রা.)ই হলেন একাজের জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

হযরত আবু বকর (রা.) এমন কঠিন মুহূর্তে তাঁর (সা.) সঙ্গী হয়েছেন। এটি অনেক ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সময় ছিল। হযরত ঈসা (আ.) যখন এমন সময়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গিরা তাঁকে ছেড়ে পলায়ন করেছিল আর একজন অভিসম্পাতও করেছিল কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই পূর্ণ বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। মোটকথা, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়েছেন এবং সওর গুহা নামে প্রসিদ্ধ একটি গুহায় তিনি আত্মগোপন করেন। দুস্কৃতিকারী কাফের যারা তাঁর অনিষ্ট সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল তারা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেই গুহা পর্যন্ত চলে আসে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, এরা তো একেবারে মাথার ওপরেই এসে উপস্থিত। কেউ একটু উঁকি মারলেই দেখতে পাবে আর আমরা ধরা পড়ে যাব। সেই সময় মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا । অর্থাৎ ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে আছেন। এই শব্দে প্রণিধান কর! কেননা এখানে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে নিজের সাথে যুক্ত করেছেন। দেখ! তিনি বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا। مَعَنَا শব্দের মাঝে উভয়েই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমার এবং আমার সাথে আছেন। আল্লাহ্ তা'লা এক পাল্লায় মহানবী (সা.)-কে এবং অপর পাল্লায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে রেখেছেন। এখন তারা উভয়েই পরীক্ষার সম্মুখীন, কেননা এটিই সেই স্থান যেখান থেকে হয় ইসলামের ভিত্তি রচিত হবে নয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। শত্রুরা গুহার মুখে উপস্থিত এবং নানা ধরণের মতামত ব্যক্ত করা হচ্ছে। কেউ বলছে, এই গুহায় তল্লাশি কর, কেননা এখানে এসেই পদচিহ্ন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদেরই কেউ কেউ বলছে, এখান দিয়ে মানুষ কীভাবে যেতে পারে যেখানে মাকড়সা জাল বুনেছে আর কবুতর ডিম পেড়ে রেখেছে? এ ধরণের কথাবর্তার আওয়াজ ভিতরে যাচ্ছে আর তাঁরা তা পরিষ্কার শুনছেন। শত্রুরা তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় নিয়ে এসেছে এবং উম্মাদের ন্যায় ছুটে এসেছে অথচ তাঁর অসাধরণ বীরত্ব দেখ! শত্রু নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাঁর সত্যিকার সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.)কে বলছেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا।

এই শব্দগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা.) মুখেই বলেন, কেননা এটি বলতে গেলে শব্দের প্রয়োজন, ইশারা ইঙ্গিতে কাজ চলে না। বাইরে শত্রুরা শলাপরামর্শ করছে আর ভিতরে সেবক ও মনিব পরস্পর আলাপচারিতায় ব্যস্ত। এ বিষয়ের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, শত্রুরা শব্দ শুনে ফেলবে। এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ এবং খোদার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ ভরসা। মহানবী (সা.)-এর বীরত্ব প্রমাণের জন্য এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্য একস্থানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিষ্পাপ নবীকে নিরাপদ রাখার জন্য এক অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, যদিও শত্রুরা সেই গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে মহানবী (সা.) নিজ সাথিকে নিয়ে আত্মগোপন করেছেন, তারা তাঁকে (সা.) দেখতে পায় নি, কেননা আল্লাহ্ তা'লা একজোড়া কবুতর সেখানে প্রেরণ করেন যারা সেই রাতেই গুহার মুখে বাসা বেঁধেছিল এবং ডিমও পেড়ে রেখেছিল। একইভাবে মাকড়সা সেই গুহার মুখে খোদার নির্দেশে তার জাল বিছিয়েছিল যার ফলে শত্রুরা ধোঁকা খেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।

আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুশলী পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) রাতে সওর গুহায় আসতেন এবং মক্কার সারাদিনের খবরাখবর প্রদান করতেন। দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতেন এবং ভোরবেলা এমনভাবে মক্কায় ফেরত আসতেন যেন তিনি মক্কাতেই রাত কাটিয়েছেন। একইসাথে আমের বিন ফুহায়রার বুদ্ধিদীপ্ততা দেখুন! তিনি রাতের বেলা দুধেল বকরিগুলোর দুধ প্রদানের পর ছাগপাল এমনভাবে ফেরত আনতেন যার মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর (রা.)-এর পদচিহ্নও সাথে সাথে মুছে দেয়া হতো।

কতিপয় জীবনীকার এটিও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আসমা (রা.) প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতেন, কিন্তু এটি অসম্ভব। কতকের সঠিক মতামত হলো, এই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় একজন নারীর প্রতিদিন এখানে আসা গোপনীয়তা প্রকাশের নামান্তর আর যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) প্রতিদিনই আসতেন সেখানে হযরত আসমা (রা.)-এর খাবার আনার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? যাহোক আল্লাহ্ ভালো জানেন। কিন্তু তিন দিন এভাবে অতিবাহিত হয়। মক্কাবাসীরা যখন নিকটবর্তী স্থানগুলো সন্ধান করে (তাঁকে খুঁজে বের করতে) ব্যর্থ হয় তখন তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে অনেক বড় একটি পুরস্কারের ঘোষণাসহ আশেপাশের জনপদগুলোতে ঘোষক প্রেরণ করে যারা ঘোষণা করছিল, মুহাম্মদ (সা.)কে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনতে পারলে একশ উট পুরস্কার দেয়া হবে। এত বড় পুরস্কারের লালসা অনেক লোককে মহানবী (সা.)-এর খোঁজে বের হতে পুনরায় উদ্যমী করে তুলে।

অপরদিকে তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর কথামত আব্দুল্লাহ্ বিন উরায়কেত উট নিয়ে আসে। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উরায়কেতের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তিন দিন পর সকালে সে উট নিয়ে পৌঁছে যাবে। এই রেওয়ায়েত থেকে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, সওর গুহা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে সকালে যাত্রা করা হয়েছিল। কিন্তু বুখারী শরীফেরই অন্য একটি রেওয়ায়েতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, সফরটি রাতে শুরু হয়েছিল। যেমন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আব্দুল্লাহ্ বিন উরায়কেতের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) আগে

থেকেই তাকে নিজেদের উটনী দিয়ে রেখেছিলেন এবং তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তৃতীয় দিন সকালে তুমি উটনীগুলো নিয়ে সওর গুহায় পৌঁছে যাবে। অতএব সে চুক্তি অনুসারে পৌঁছে যায়। এটি বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন, মহানবী (সা.) রাতের বেলা রওয়ানা হয়েছিলেন আর বুখারী শরীফেরই অন্য একটি রেওয়ায়েতে এর সত্যায়ন পাওয়া যায়। এছাড়া এটিই অনুমেয় বিষয় যে, রাতের বেলাই তিনি (সা.) যাত্রা করে থাকবেন।

মহানবী (সা.) পহেলা রবিউল আউয়াল সোমবার রাতে গুহা থেকে বের হয়ে যাত্রা করেন। ইবনে সা'দ–এর মতে তিনি (সা.) ৪ রবিউল আউয়াল সোমবার রাতে গুহা থেকে যাত্রা করেন। প্রথমটি তারিখুল খামিসের বর্ণনা। সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী লিখেন, ইমাম হাকেম বলেন, এ সম্পর্কে মুতাওয়াতের (বহু নীর্ভরযোগ্য উৎস থেকে বর্ণিত) মত হল, হুযূর (সা.)-এর মক্কা থেকে যাত্রা করার দিনটি সোমবার ছিল এবং মদীনায় প্রবেশের দিনটিও সোমবার ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ বিন মূসা খাওয়ারযমি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে বৃহস্পতিবার যাত্রা করেন। আল্লামা ইবনে হাজর এসব রেওয়ায়ের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে লিখেন, রসূল করীম (সা.) মক্কা থেকে বৃহস্পতিবারই যাত্রা করেছিলেন কিন্তু গুহায় শুক্র, শনি ও রবিবার– এই তিন রাত অবস্থান করার পর সোমবার রাতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মহানবী (সা.) কাসওয়া নামের একটি উটনীতে আরোহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার উটনীতে নিজের সাথে আমের বিন ফুহায়রাকে উঠিয়ে নেন এবং উরায়কেত তার উটে আরোহণ করে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতে সব মিলে পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহাম জমা ছিল তা-ও তিনি সাথে নিয়ে নেন। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে আমের বিন ফুহায়রা এবং হযরত আসমা (রা.) খাবার নিয়ে আসেন যাতে ছাগলের ভুনা মাংস ছিল কিন্তু এখানে পৌঁছার পর দেখেন যে, খাবার এবং মশক বাঁধার জন্য কোন কাপড় নেই। তখন হযরত আসমা (রা.) তাঁর নিতাক বা কমর বন্ধনী খুলে তা দুই ভাগ করেন আর এরপর একটি দিয়ে খাবার এবং একটি দিয়ে মশকের মুখ বাঁধেন। মহানবী (সা.) হযরত আসমা (রা.)কে জান্নাতে দুটি নিতাকের সুসংবাদ দেয়ার পর তাদের সবাইকে বিদায় জানান এবং এই দোয়া করতে করতে সফর শুরু করেন যে, **আল্লাহুম্মাসহাবনি ফি সাফারি ওয়াখলুফনি ফি আহলী,** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার সফরে তুমি আমার সাথি হও এবং (আমার অবর্তমানে) আমার পরিবারে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কমরবন্ধনী দিয়ে খাবার বাঁধার ঘটনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে যাত্রা করার সময় ঘটেছিল। কিন্তু যাহোক, এখানেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থাৎ ইতিহাসে এ ঘটনাটি দু'টি উপলক্ষ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, মহানবী (সা.) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে সওর গুহা অভিমুখে যাত্রা করছিলেন সেসময়কার ঘটনা আবার কারো কারো মতে এটি তখনকার ঘটনা যখন মহানবী (সা.) সওর গুহা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন। যাহোক, এই উভয় রেওয়ায়েতই বিদ্যমান। কিন্তু বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) হিজরতের সফরের যে বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন সেই রেওয়ায়েতের ধারাবাহিকতা অনুসারে এটাই বুঝা যায় যে, এটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে যাত্রা করার সময়কার ঘটনা। তাই, বুখারীর রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেয়াই অধিক সমীচীন হবে কেননা, প্রথমতঃ সওর গুহায় অবস্থান করাকে যেভাবে গোপনীয় রাখা হয়েছে

সেক্ষেত্রে হযরত আসমা (রা.)-এর সেখানে খাবার নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। যেখানে দু'জন পুরুষ হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি বকর ও আমির বিন ফোহায়রা প্রতিদিন সংগোপনে যাতায়াত করতেন সেখানে এ মহিলার যাওয়া নিরাপত্তা ও সাবধানতার দাবির পরিপন্থি মনে হয়। তাই নিজ ঘরেও কমরবন্ধনী দিয়ে খাবার বেঁধে দেয়ার যে ঘটনা রয়েছে তাতে হযরত আসমা (রা.)-এর আত্মনিবেদন ও গভীর ভালোবাসার ঝলকই প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ সেসময় খাবার বাঁধার জন্য অন্য কোন জিনিস খুঁজে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে (গুহার ক্ষেত্রে হয়ত একথা বলা যায় যে, এটি যেহেতু গুহার ঘটনা তাই সেখানে অন্য কোন জিনিষ ছিল না। কিন্তু এঘটনা ঘরেও হতে পারে যে, তাৎক্ষণিকভাবে বাঁধার জন্য কোন জিনিস পাওয়া যায় নি আর সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল তাই) নিজের কমরবন্ধনী খুলে খাবার বেঁধে দিয়ে হযরত আবু বকর ও মহানবী (সা.)-কে তিনি বিদায় দেন। তাই, বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে, এটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয় যে, খাবার বেঁধে দেয়ার ঘটনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় সংঘটিত হয়ে থাকবে, সওর গুহা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালের ঘটনা নয়। যাহোক, আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত আবু বকর তাঁর সব ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে নেন যার পরিমাণ পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহাম ছিল। তিনি বর্ণনা করেন, আমাদের দাদাজান আবু কুহাফা আমাদের কাছে আসেন, এরপূর্বেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি এসে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি মনে করি, সে অর্থাৎ হযরত আবু বকর নিজ জীবনের পাশাপাশি তার ধন-সম্পদের মাধ্যমে তোমাদেরকেও বিপদে ফেলে গেছে। একথা শুনে হযরত আসমা (রা.) বলেন, না, দাদাজান! কক্ষনো না, তিনি তো আমাদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি বলেন, এরপর আমি কিছু পাথর নিয়ে সেগুলোকে ঘরের ঘুলঘুলিতে রেখে দিই যেখানে আমার পিতা টাকা পয়সা রাখতেন। এরপর সেগুলোকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিই এবং দাদাজানের হাত ধরে আমি বলি, দাদাজান! এই সম্পদের ওপর নিজের হাত রেখে তো দেখুন। তিনি সেগুলোর ওপর নিজ হাত রেখে বলেন, ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই, সে যদি তোমাদের জন্য এত অর্থ রেখে গিয়ে তাকে তাহলে সে ভালোই করেছে। হযরত আসমা বলেন, আল্লাহর কসম হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের জন্য কিছুই রেখে যান নি কিন্তু আমি সেই বয়োবৃদ্ধকে এভাবে আশ্বস্ত করার ইচ্ছা করলাম। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সওর গুহা থেকে যাত্রার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

সওর গুহা থেকে বের হয়ে তিনি একটি উটনিতে চড়ে বসেন যার নাম কতিপয় রেওয়ায়েতে কাসওয়া বর্ণিত হয়েছে। আর অপর উটনিতে হযরত আবু বকর (রা.) এবং তার সেবক আমের বিন ফুহায়রা বসেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি মক্কার দিকে শেষবারের মত ফিরে তাকান এবং আক্ষেপের সাথে বলেন, হে মক্কা নগরী! সকল স্থানের মাঝে তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরা নিজেদের নবীকে বহিষ্কার করেছে এখন নিশ্চয় এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দু'দিন সেই গুহাতেই অপেক্ষা করার পর পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতের বেলা গুহার কাছে বাহন নিয়ে আসা হয় এবং দু'টি দ্রুতগামী উটনিতে চড়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা যাত্রা করেন। একটি উটনির ওপর চড়েন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং পথপ্রদর্শক (গাইড) অর্থাৎ এরূপ একটি বর্ণনাও

আছে যে, উভয়ে একই বাহনে চড়েছিলেন, অপর এক বর্ণনামতে উটনি ছিল তিনটি। যা-ই হোক, দ্বিতীয় উটনিতে চড়েন হযরত আবু বকর (রা.) ও তার কর্মচারী আমের বিন ফুহায়রা। মদীনা অভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার দিকে মুখ তুলে তাকান; সেই পবিত্র নগরীর দিকে যেখানে তিনি (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি (সা.) নবুওয়প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুগ থেকে তাঁর (সা.) পিতৃপুরুষ বসবাস করে আসছিলেন। তিনি (সা.) শেষবারের মত তাকান এবং আক্ষেপের সাথে সেই নগরীকে সম্বোধন করে বলেন, হে মক্কা নগরী! তুমি আমার কাছে সকল স্থানের চেয়ে অধিক প্রিয়! কিন্তু তোমার বাসিন্দারা আমাকে এখানে থাকতে দিল না! সেসময় আবু বকর (রা.)-ও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন, এরা নিজেদের নবীকে বের করে দিল, এখন তো এরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে!

এক রেওয়ায়েত অনুসারে যখন তারা **জুহফা** নামক স্থানে পৌঁছেন, [জুহফা মক্কা থেকে প্রায় ৮২ মাইল দূরে অবস্থিত;] তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই যিনি তোমার ওপর কুরআন ফরয করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে এক প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে আনবেন।' এই পথচলা সারারাত চলতে থাকে; পথ চলতে চলতে যখন প্রায় দুপুর হওয়ার উপক্রম, তখন কাফেলা একটি পাথরের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামে। হযরত আবু বকর বিছানা বিছিয়ে দেন এবং মহানবী (সা.)-কে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেন। তাই মহানবী (সা.) শুয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর তখন এটি দেখতে বেরিয়ে পড়েন– কেউ পিছু ধাওয়া করে আসছে না-তো! ততক্ষণে দূর থেকে ছায়ার সন্ধানে এক রাখাল ছাগপাল নিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়। হযরত আবু বকর বলেন, "আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'ছেলে, তুমি কার কর্মচারী?' সে বলে, 'কুরাইশের এক ব্যক্তির'; সে তার নাম বললে আমি তাকে চিনতে পারি। আমি বলি, 'তোমার ছাগপালে কি একটু দুধ হবে?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি আমাদের জন্য একটু দুধ দোহন করতে পারবে?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং আমি তাকে দুধ দোহন করতে বলি। সে তার ছাগলগুলো থেকে একটি ছাগলের পা নিজের গোছা ও রানের ভাঁজে চেপে ধরে, আর আমি তাকে বলি, 'প্রথমে ওলান ভালভাবে পরিষ্কার করে নাও।' তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুধ পাত্রে ঢেলে নেই।" তাতে পানি ঢালি যেন দুধের তাপমাত্রা একটু কমে যায় এবং দুধ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করি। কতিপয় রেওয়ায়েতে রয়েছে, যখন হযরত আবু বকর দুধ নিয়ে উপস্থিত হন তখনও মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে ছিলেন; হযরত আবু বকর তাঁর (সা.) বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো সমীচীন মনে করেন নি, তাই তাঁর (সা.) জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। জেগে ওঠার পর তিনি দুধ উপস্থাপন করেন এবং নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! পান করুন।' হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'তিনি (সা.) এতটা পান করলেন (যা দেখে) আমি আনন্দিত হলাম। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল, যাত্রা করার সময় হয়েছে।' তিনি (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ'। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) নিজেই বলেন, 'এখন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করা যাক।' তিনি (রা.) নিবেদন করেন, 'জ্বি, আমার মনীব!' অতঃপর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হয়।

সুরাকা বিন মালেকের পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনা এরূপ: উরায়কিতের মত দক্ষ গাইডের তত্ত্বাবধানে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদগুলোর দিক দিয়ে মদীনা অভিমুখে এই যাত্রা আরম্ভ করা হয়েছিল, যা মদীনা যাবার মূল পথের চেয়ে ভিন্ন ছিল।

মক্কা এবং এর আশপাশের জনবসতিগুলোতে একশ উট পুরস্কারের সাধারণ ঘোষণা দেয়া হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই এই মূল্যবান পুরস্কার লাভের বাসনা রাখত। সুরাকা বিন মালিক যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন আর ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, কাফের কুরাইশের দূত আমাদের কাছে আসে। তারা মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) উভয়কে যারা হত্যা করবে অথবা জীবিত বন্দী করবে তাদের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছিল। সুরাকা বলেন, আমি আমার বংশ বনু মাদলাজের একটি মজলিসে বসে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি তাদের সামনে দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল । সে বলল, হে সুরাকা! আমি উপকূলীয় অঞ্চলে ছায়ার মত কিছু দেখেছি বা বলে যে, তিন জনের একটি কাফেলা চলে যেতে দেখেছি এবং আমি মনে করি এটা মুহাম্মদ-ই (সা.)। সুরাকা বিন মালেক বলল, আমি বুঝে গেছি যে, এটি অবশ্যই মুহাম্মদের কাফেলাই হবে কিন্তু আমি চাইতাম না যে, এই পুরস্কারে আমার সাথে অন্য কেউ ভাগ বসাক। আমি দ্রুত পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা নিয়ন্ত্রণ করলাম এবং তথ্যদাতাকে চোখের ইশারায় চুপ থাকার ইঙ্গিত দিলাম এবং আমি নিজেই বললাম, না- এটা মুহাম্মদের কাফেলা হতে পারে না, বরং তুমি যাদের কথা বলছ তারা তো এখনই আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছে, তারা তো অমুক গোত্রের লোক যারা হারিয়ে যাওয়া উটনির সন্ধানে যাচ্ছিল। সুরাকা বলে, আমি এই বৈঠকে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম যাতে কারও কোন সন্দেহ না হয় এবং তারপর আমি আমার একজন দাসীকে বললাম আমার দ্রুতগামী ঘোড়াটি নিয়ে বাড়ির পেছনে অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ পর তিনিন নিজেই সেখানে পৌঁছেন। বর্ণনা করেন যে, আমি একটি ভাগ্য নির্ধারনী লটারী করি কিন্তু তা এই যাত্রার বিপক্ষে যায়। আমি তার পরওয়া করি নি আর ঘোড়ার গায়ে গোড়ালি মেরে অদৃশ্য হয়ে গেলাম আর দ্রুত গতিতে সেই কাফেলার পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম। আমার ধারণা অনুসারে এটি মুহাম্মদ (সা.)-এরই কাফেলা ছিল। সুরাকা বলেন একের পর এক মাইল ফলক অতিক্রম করে আমি শিগ্রই কাফেলার কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। তাদের অদূরেই আমার ঘোড়া অস্বাভাবিকভাবে হোঁচট খায় আর আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম।

অতঃপর আমি উঠে দাড়ালাম এবং ভাগ্য নির্ধারনী লটারী করলাম এবং লটারী আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল কিন্তু আমি মুহাম্মাদ (সা.)-কে ফিরিয়ে নিয়ে একশত উটের পুরস্কার পেতে চাই। অতঃপর আমি উঠে আবার ঘোড়ায় চড়লাম এবং তখন আমি এত কাছে ছিলাম যে, আমি চিনতে পারলাম যে, এটি মুহাম্মদ ও আবু বকরই ছিল বরং আমি মহানবী (সা.)-এর কিছু একটা পাঠ করার শব্দ শুনতে পাই। তখনই আমার ঘোড়া মারাত্মকভাবে হোঁচট খায় এবং তার পা বালিতে আটকে যায় আর আমি পড়ে যাই। তারপর আমি ঘোড়াটিকে ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম অর্থাৎ ভালো মন্দ বললাম যে, সে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু ঘোড়া মাটি থেকে নিজের পা বের করতে পারছিল না। অবশেষে, যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তখন তার পা থেকে ধুলা বাতাসে ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ে। এতটাই ঢুকে ছিল যে যখন পা বের করল তখন মাটি অথবা বালী থেকে ধুলা উড়া শুরু করল। সে বলে যে, এখন আমি আবার তীর দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করলাম, তাই বের হলো যা আমার পছন্দ হয় নি। আমি সেখান থেকে নিরাপত্তার আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে ডেকে বললাম, আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করব না। এতে মহানবী (সা.) আবু বকর (রা.) কে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর যে, সে কি চায়। সে বলল, আমি সুরাকা আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই । এতে তারা থামলো।

সুরাকা বলতে লাগল, মক্কাবাসীরা তাঁকে {অর্থাৎ মহানবী (সা.) কে} জীবিত অথবা মৃত ধরে আনার জন্য একশত উটের পুরস্কার নির্ধারণ করেছে এবং আমি এই লোভে আপনাদের পিছু ধাওয়া করে এসেছি, কিন্তু আমার সাথে যা ঘটেছে তাতে আমি নিশ্চিত যে আমার এই পিছু ধাওয়া করা সঠিক নয়। সে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে পাথেয় ইত্যাদি পেশ করে কিন্তু মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করেন নি। তিনি শুধু এতটুকু বলেন যে, আমাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না। সে এই অঙ্গীকার করে আর একইসাথে এই নিবেদনও করে যে, আমার বিশ্বাস হলো আপনি একদিন রাজত্ব লাভ করবেন। আমাকে কোন অঙ্গীকারপত্র লিখে দিন যে, তখন আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হলে আমার সাথে যেন সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে নিরাপত্তাপত্র লিখে দেয়ার অনুরোধ করেছিল। অতএব মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর এবং আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমের বিন ফুহায়রা তাকে সেই পত্র লিখে দেন আর সে উক্ত পত্র নিয়ে ফিরে আসে।

এই স্মৃতিচারণ এখন ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ নতুন বছরও আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই নববর্ষ জামা'তের সদস্যদের জন্য এবং জামা'তের জন্য সমষ্টিগতভাবে সকল দিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে জামা'তকে সুরক্ষিত রাখুন। আর জামা'তের বিরুদ্ধে শত্রুদের যত ষড়যন্ত্র রয়েছে, সকল ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেসব প্রতিশ্রুতি যেন আমরাও নিজেদের জীবনে অধিক হারে পূর্ণ হতে দেখতে পাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই দৃশ্যও প্রদর্শন করুন। অতএব অধিক হারে দোয়া করুন। নতুন বছরে দোয়ার সাথে প্রবেশ করুন। তাহাজ্জুদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কোন কোন মসজিদে হচ্ছেও বটে, বাকি যেখানে ব্যবস্থা নেই সেখানেও (আয়োজন) করা উচিত। যদি বাজামা'ত না হয় তাহলে ব্যক্তিগতভাবেও এবং ঘরেও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা উচিত এবং দোয়া করা উচিত। প্রথমত এটি স্থায়ী অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আগামীকাল থেকে বা আজ রাত থেকে যখন পড়বেন তখন চেষ্টা করুন যেন এটি জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিকও দান করুন। দরূদ শরীফ এবং ইস্তেগফার ছাড়া এই দোয়াগুলোও অধিক হারে পাঠ করুন। رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ। অর্থাৎ, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কৃপা কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা' (সূরা আলে ইমরান: ০৯)। অতঃপর এই দোয়াও পাঠ করুন যে, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ও নিজেদের কর্মকাণ্ডে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর এবং আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় কর, আর অস্বীকারকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর' (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এই তৌফিক দান করুন।

এখন আমি জুমুআর নামাযের পর কয়েক জনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তাদেরও স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মোকাররম মালেক ফারুক আহমদ খোখার সাহেবের, তিনি মুলতান জেলার আমীর ছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর তারিখে ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা ছিলেন মোকাররম মালেক উমর আলী খোখার সাহেব, যাকে মুলতানের রঈস বলা হতো। আর মাতা ছিলেন সৈয়্যদা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা। তিনি সৈয়্যদা বেগম নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত

মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের কন্যা ছিলেন। হযরত মালেক উমর আলী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন নিজের যৌবনকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফতকালে। কাদিয়ান গিয়ে তিনি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মালেক উমর আলী সাহেবের মৃত্যু স্বল্প বয়সে হয়ে যায়। তখন মালেক ফারুক আহমদ সাহেবের বয়স প্রায় ২২ বছর ছিল, অর্থাৎ তিনি প্রায় যুবকই ছিলেন। করাচীতে মালেক সাহেবের জমিজমার পাশাপাশি কিছু ব্যবসা ছিল। সেটি তিনি খুবই উত্তমরূপে সামলান। তার দুজন মাতা ছিলেন। ভাইবোনদের উত্তমভাবে লালনপালন করেন। মালেক ফারুক খোখার সাহেব দীর্ঘকাল খোদ্দামুল আহমদীয়া মুলতানের জেলা কায়েদ এবং এরপর মুলতানের আঞ্চলিক কায়েদ হিসেবে সেবা করেছেন। ১৯৮০ থেকে ৮৫ সন পর্যন্ত মুলতান জেলার আমীর হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। সেই সময় মুলতান শহরের আমীর হিসেবেও তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার বিয়ে হয়েছিল ১৯৬৮ সনে হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেবের কন্যা দুরদানা সাহেবার সাথে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বিয়ে পড়িয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা দান করেছেন। তার স্ত্রী বলেন, মরহুম খুবই স্নেহশীল এবং যত্নবান ছিলেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়াদিরও খেয়াল রাখতেন। রীতিমতো তাহাজ্জুদ পড়তেন আর আমাকেও প্রতিদিন তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন। যেদিন মৃত্যু বরণ করেছেন সেদিনও নফল পড়েন, নামায আদায় করেন এবং এরপর ঘুমিয়ে পড়েন। সর্বদা ওযুতে থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, যখন জামা'তের আমীর ছিলেন না তখনও কোন আহমদীর কোন সমস্যা হলে, যে কোন সময় কারো কোন ফোন আসলে তাৎক্ষণিকভাবে কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। যখন জামা'তের আমীর হয়েছেন তখন আমার জন্য এই নির্দেশ ছিল যে, সর্বদা খাবার এবং চায়ের আয়োজন প্রস্তুত থাকা চাই, যেকোন সময় কোন অতিথির আগমন হতে পারে। তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে না যে, আমার ঘর কখনো অতিথিশূন্য ছিল বা কেউ না কেউ স্থায়ীভাবে অবস্থান করতো না। কতিপয় মুরব্বীকেও নিজের ঘরে থাকার সুযোগ করে দিতেন। তার ঘরও অফিস হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। অনেক উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। সকল অ-আহমদী আত্মীয়, বরং পুরো খোখার পরিবার তাকে অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসতো। তিনি সর্বদা সবার সাথে আন্তরিকভাবে সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর তিলাওয়াত খুবই সুন্দর ছিল। তিনি বলেন, আমি যখন তিলাওয়াত করতাম তখন পবিত্র কুরআন না খুলেই আমার তিলাওয়াতের সংশোধন করে দিতেন। তার পুত্র তালহা বলেন, নিজের উভয় মায়ের খুবই খেয়াল রাখেন এবং কখনো কোন পার্থক্য করেন নি আর নিজের সকল ভাইবোনের বিয়েও নিজেই করিয়েছেন। তার ঘরও তার হৃদয়ের ন্যায় সবার জন্য সর্বদা খোলা ছিল, বিশেষত জামা'তের ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্য। মারি-র খায়রা গলিতে তার একটি ঘর ছিল। তিনি বলতেন যে, এটিতো আমি জামা'তের জন্যই বানিয়েছি। কখনো কাউকে মানা করেন নি, যে-ই সেখানে গিয়ে থাকতে চাইতো থাকতে পারতো। ১৯৮৪ সনের অর্ডিন্যান্সোত্তর পরীক্ষার যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়, নিজের সাহসী ব্যক্তিত্বের দ্বারা মুলতান জেলা এবং শহরের সকল সঙ্গীকে সর্বদা সাহস যুগিয়েছেন, তাদেরকে কখনো দুর্বল হতে দেন নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের সফরে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি হুযূরের কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া এক স্থানে কাফেলাকে তিনি নেতৃত্বও দিয়েছেন। তার পুত্র লিখেন যে, আব্বার

এমারতকালে আমাদের ঘর, ঘরের চেয়ে বেশি অফিস ছিল, খুবই কর্মচঞ্চল থাকত। জমিজমার কাজ তিনি নিজের ছোট ভাইয়ের দায়িত্বে দিয়ে দেন আর নিজের পুরো সময় ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে দেন। সবাই অকৃত্রিমভাবে আসতো, অকৃত্রিম প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। অ-আহমদী আত্মীয়স্বজনদের আর্থিক সাহায্যও করতেন। তিনি বলেন, তার জানাযায় আমাদের কতিপয় আত্মীয়স্বজন আসেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আজ আমরা এতিম হয়ে গেছি, কেননা তিনি তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তিনি বলেন, সর্বদা আমাদেরকে নামাযের বিষয়ে নসীহত করতেন, বিশেষত ফজরের নামাযের জন্য। তার ছোট কন্যা ফায়েযা বলেন, আব্বার আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা আমাদের জন্য এক আদর্শ ছিল। সব ধরনের সময় দেখেছেন। যৌবনে এতিম হয়েছেন। সর্বপ্রকার অবস্থা দেখেছেন, কষ্টের যুগও এবং সাচ্ছন্দ্যের যুগও। কিন্তু শিশুকাল থেকে দেখেছি যে, আমার পিতা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন আর সর্বদা বলতেন যে, আমার সকল কাজ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং করেন। তিনি বলেন, খিলাফতের প্রতি আব্বার অসাধারণ ভালোবাসা ছিল আর খিলাফতের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলতেন। একটি পরীক্ষারও তিনি সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেটিও তিনি খুবই ধৈর্য এবং দোয়ার সাথে অতিবাহিত করেছেন।

তার ছোট ভাই মালেক তারেক আলী খোখার, যিনি দ্বিতীয় মায়ের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন, আমার বয়স ছিল ০৯ বছর যখন আমার পিতা মৃত্যু বরণ করেন। আর আমার এই বড় ভাইজান মালেক ফারুক সাহেব ছিলেন ২২ বছরের যুবক। কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় আমাদের দেখাশোনা করেছেন আর সারা জীবন আমাকে কখনো পিতার অভাব বুঝতে দেন নি। এরপর তিনি লিখেন, অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনের ওপর তার বিশেষ প্রভাব-প্রতাপ ছিল এবং তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবানও ছিলেন। বহু আহমদী পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করছিলেন। অনেক শিশুকে পড়ালেখার সুযোগ করে দিয়ে জীবিকা উপার্জনের যোগ্য করে তুলেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমার ভাই প্রত্যেক অভাবী-অসহায়কে ঋণ প্রদান করতেন এবং কখনো তা ফেরত চান নি। সর্বদা করযায়ে হাসানা হিসেবে প্রদান করতেন। অনেক নওআহমদী বলেছেন যে, আমরা আহমদীয়াত গ্রহণের পর স্বজনের মতো যত্ন নিয়ে মালেক ফারুক আহমদ খোখার সাহেবই আমাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রেখেছেন। আশি বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু বিগত দু'বছর যাবৎ তার হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায়ের চিন্তা ছিল প্রবল। বেশিরভাগ অংশ আদায় করেও দিয়েছেন, কিছু অংশ বাকি আছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকে বাকি অংশটুকুও আদায়ের তৌফিক দান করুন। তার বোন তাহেরা বলেন, ইনিও দ্বিতীয় মায়ের ঘরের, আমার ভাই সর্বদা আমার সাথে একজন স্নেহশীল পিতার ন্যায় আচরণ করেছেন। সবচেয়ে বড় গুণ এটি ছিল যে, তিনি কখনো আপন ও বৈমাত্রেয়-এর পার্থক্য করেন নি। সব ভাইবোনদের সাথে সমান আচরণ করেছেন এবং উভয় মায়ের সাথেও সমান আচরণ করেছেন। আমাদের কখনো এটি অনুভব করতে দেন নি যে, আমাদের মা ভিন্ন। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি সত্যিকার অর্থেই আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন; যেভাবে এক পিতা নীরবে তার মেয়ের সুখ-দুঃখে কাজে আসে তদ্রুপ তার সাথেও আমার একই সম্পর্ক ছিল। এরপর তার মেয়ে নমুদে সেহের বলেন, কিছু বিষয় আমার বাবার জীবনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং বার বার স্মরণ হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার আতিথেয়তা এবং মানুষের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক। এরপর তিনি বলেন, অতিথি আপ্যায়নের এরূপ

অবস্থা ছিল যে, খাবার রান্না হয়ে যাবার পর কোন মেহমান চলে আসলে পরিবারের সদস্যরা খাবারের জন্য বসে থাকত, কিন্তু সেই খাবার বাইরে মেহমানদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হতো আর ঘরের সদস্যরা ডিম ভাজি করে খেয়ে নিত। এরপর বলেন, মানুষের জীবনে অনেক ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, অবস্থায় পরিবর্তনও এসে থাকে আর এ কারণে তাকে কতিপয় পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু কখনো খিলাফত সম্পর্কে তিনি এমন কোন কথা বলেন নি, যদ্বারা আমাদের কখনো এই ধারণা হতে পারে যে, যুগ খলীফা ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। আমাদের ঘরে সর্বদা খুতবা শোনা এবং জামা'তের সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হতো। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদের ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া নিবাসী রহমতউল্লাহ্ সাহেবের। তিনি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। পূর্ব জাভায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮০ সনে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের প্রাক্তন মুবাল্লেগ ইনচার্জ মোকার্‌রম সুয়ূতী আযীয আহমদ সাহেবের মাধ্যমে বয়'আত করে জামাতভুক্ত হন। ১৯৯৩ সনে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি সেখানকার কেরেং নেটগা জামা'তে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন সন্তান ও ছয়জন দৌহিত্র রয়েছে। তার সহধর্মিণী লিখেন, মরহুম একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাতে তিনি নিজেকে মানুষের ভিড়ে সারিতে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পান। তিনি স্বপ্নে কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে, কোন্ সারিতে দাঁড়াব? কেউ একজন একটি সারির দিকে নির্দেশ করে যাতে একজন পবিত্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। মরহুম সেই পবিত্র ব্যক্তিকে চিনতে পারেন নি। কিছুদিন পর জানা যায় যে, তিনি স্বপ্নে যে পবিত্র ব্যক্তিকে দেখেছিলেন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছিলেন। এজন্যই মরহুম জামা'তের সত্যতা স্বীকার করেন এবং এরপর বয়'আতও করেন। তার মেয়ে লিখেন, মরহুম বয়'আত করার পর স্থানীয় জামা'ত ছাড়াও স্থানীয় মজলিস আনসারুল্লাহ্-তে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিরোধীদের পক্ষ হতে জামা'তের ওপর আক্রমণ এবং হুমকি-ধমকি দেয়া হতো। মরহুম অত্যন্ত বীরত্বের সাথে জামা'তের পক্ষ হতে প্রতিরোধ করতেন। অনেক উদার ছিলেন। যখনই কেউ সাহায্যের জন্য অথবা ঋণ গ্রহণের জন্য আসতো তখন সবসময় তার সাহায্য করতেন। তার তৃতীয় মেয়ে লিখেন, মরহুম খিলাফতের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা রাখতেন এবং একান্ত আনুগত্যশীল ছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর জনাব আব্দুল বাসেত সাহেব লিখেন, মরহুম জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। তিনি বলেন, সেখানকার পশ্চিম জাভার একটি শহরে আমাদের একটি জামা'ত রয়েছে। জামা'তের বিরোধীরা কয়েকবার সেখানে আমাদের মসজিদে আক্রমণ চালায় আর স্থানীয় প্রশাসনকে জামা'তের কার্যক্রমের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্য বলে। সে সময় রহমত উল্লাহ্ সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিরোধী এবং স্থানীয় প্রশাসনের সম্মুখীন হন এবং তাদের আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। মরহুমের প্রচেষ্টার কারণে সেখানে এখন পর্যন্ত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে আর কোথাও কোন বিধি-নিষেধ আরোপিত হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো কাশ্মীরের ইয়ারিপুরা নিবাসী আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ টাক সাহেবের। তিনি গত ২৪ ডিসেম্বর তারিখে ৯৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ইয়ারিপুরা নিবাসী মুহাম্মদ আকরাম টাক সাহেবের পুত্র ছিলেন, যিনি উক্ত এলাকার প্রাথমিক আহমদীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত নেক, নম্র প্রকৃতির, মিশুক, সকলের প্রিয়ভাজন, গম্ভীর ও নীরব প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। দীর্ঘকাল জামা'তের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। জাম্মু ও কাশ্মীরের প্রাদেশিক আমীর ছাড়াও জেলা আমীর ও নাযেম আনসারুল্লাহ্ হিসেবেও সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। স্থানীয় জামা'তে স্থানীয় কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করে গেছেন। বছরের পর বছর আঞ্জুমানে তাহরীকে জাদীদ, ভারতের অনারারী সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ১৯৮৭ সালে কাশ্মীর উপত্যকায় জামা'তের পক্ষ থেকে পাঁচটি স্কুল স্থাপিত হয়। অনেক মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। যুবকদের মেধার উৎকর্ষ সাধন ও তাদের যোগ্য করে তোলার জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করেছেন আর এ কাজে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। ইয়ারিপুরা এলাকায় তার সমাজকল্যামূলক কাজের জন্য মানুষের মাঝে তিনি অনেক সম্মানিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার পরবর্তী প্রজন্মকেও নেক ও সৎকর্মশীল করুন এবং জামা'তের সেবা করার সুযোগ দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত)